কথামৃতের আবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আজ পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

প্রব্রাজিকা প্রেমপ্রাণা
পরমপূজনীয়া সঙ্ঘাধ্যক্ষা
শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

দিনে দিনে এর জনপ্রিয়তা এবং আবেদন বেড়েই চলেছে। ভগবান স্বয়ং দেহধারণ করে এসে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কীভাবে ভগবানকে লাভ করা যায়, কীভাবে শান্তিতে আনন্দে থাকা যায়। মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা আমরা শ্রীম-কথিত এই কথামৃতের পাতায় পাতায় দেখতে পাই। সেজন্যই বইটির এত আকর্ষণ।

'শ্রীম'---কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রথমদিন ঠাকুরের ঘরে গিয়ে দেখলেন, ছোট খাটটিতে ঠাকুর বসে আছেন, মেঝেতে ভক্তেরা। তাঁর সেদিন মনে হয়েছিল, শুকদেব যেন ভাগবত বলছেন আর সমস্ত তীর্থের সমাগম হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবত 'কথামৃত'ও পরে শ্রীম-ই লিখেছিলেন। তারপরের তিনবারে ঠাকুর তাঁর সব কথা জেনে নিয়েছেন। চতুর্থ দিন যখন বিকেলে গেছেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে হো-হো করে হেসে বলছেন—একটা ময়ূরকে চারটের সময় আফিম খাওয়ানো হয়েছিল, পরদিন ঠিক চারটের সময় সে এসে হাজির। মাস্টারমশাই নিজে পরে ভাবছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো ঠিকই বলেছেন। বাড়িতে যাই কিন্তু মন এখানেই পড়ে থাকে। এভাবে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে ধীরে ধীরে তাঁর দিকে নিয়ে এলেন। শ্রীম পণ্ডিত মানুষ, একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত—সবেতেই পণ্ডিত; আবার শাস্ত্রও পড়েছেন। সেই মানুষটি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে ভগবদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে গেলেন! পরে আমরা দেখব, তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর থেকে অন্তত তেইশ দিন দক্ষিণেশ্বরে থেকে সাধনভজন করেছিলেন। ঠাকুরকে জানিয়েছিলেন, তিনি সেখানেই থাকবেন ও সাধুর মতো জীবনযাপন করবেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁকে সাধনভজন করিয়ে নিয়ে গৃহী সন্ন্যাসী করেছিলেন।

ঠাকুর উপদেশ দিতেন, ''সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা—সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।'' সেই ভাব নিয়ে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরের কথা প্রথম লেখেন 'Gospel of Sri Ramakrishna' নামে, যা পুস্তিকাকারে ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সকলের পক্ষে তো ইংরেজিতে বোঝা সম্ভব নয়, তাই পরে রামচন্দ্র দত্তের অনুরোধে বাংলায় বৃহত্তর আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯০২, ১৯০৪, ১৯০৮, এবং ১৯১০—এই চার বছরে কথামৃতের চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীমা কথামৃত শুনে বলেছিলেন, তাঁর মনে হচ্ছে ঠাকুরই যেন কথা বলছেন। মাস্টারমশাই ১৯৩২ সালে পঞ্চম খণ্ড শেষ করেন। বইটির প্রুফও তিনি দেখেছিলেন; তারপরই দেহত্যাগ করেন। তাঁর অন্তিম প্রার্থনা ছিল : ''মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও।'' তখন তাঁর বয়স আটাত্তর। পাঁচ খণ্ড কথামৃত ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন স্বামী নিখিলানন্দ। তার ভূমিকায় বিশিষ্ট ইংরেজ দার্শনিক এবং লেখক অলডাস হাক্সলি বলেছেন, জীবনীসাহিত্যে এইরকম বই আর কোনও দেশের কোনও ভাষায় তিনি দেখেননি। সত্যিই, ফটোতে যেমন সব তুলে রাখা যায় ঠিক তেমন করে কথামৃতে মাস্টারমশাই যেন ছবি তুলে রেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, কী বলছেন, কেমন করে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—সবকিছু আমরা যেন চলচ্চিত্রের মতো দেখতে পাই। আর কোনও অবতারের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। কোনও অবতারের মুখের কথা এভাবে রক্ষিত হয়নি। ঠাকুর যেমনটি বলতেন, তেমনটি সেদিনই বাড়ি ফিরে মাস্টারমশাই লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট, চৈতন্যদেব এঁদের উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাঁদের দেহত্যাগের বহু বছর পর। তাই তার মধ্যে অন্যের কথা ঢুকে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কথামৃতের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সেজন্য কথামৃতের একটা অন্যরকম আবেদন রয়েছে। কথামৃতের পাতাগুলি যেন সেইসময়ের ছবি। কথামৃতের দু-চারটি পাতার কথা এখানে বলব।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, অশোক, আমলকী—এই পাঁচটি গাছ রোপণ করে পঞ্চবটী করেছিলেন; বৃন্দাবনের রজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সাধনা করতেন, তপস্যা করতেন। এইরকম একটা সুন্দর দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভাসে। সেখানে বৃন্দাবন থেকে একটা মাধবীলতা এনে পুঁতেছিলেন। সেই গাছটি খুব বড় হয়েছে। তাতে ছোট ছেলেরা দোল খাচ্ছে, ঠাকুর আনন্দে দেখছেন আর বলছেন, ''বাঁদুরে ছানার ভাব। পড়লে ছাড়ে না।'' একদিন পঞ্চবটীর কাছে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, ''একদিন দেখি—কালীঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত এক অদ্ভুত মূর্তি। এ তোমার বিশ্বাস হয়?'' মাস্টারমশাই অবাক হয়ে গেলেন। ডাল থেকে দু-একটি পাতা তিনি নিজের পকেটে রাখলেন। ঠাকুর দেখে বলছেন, ''এই ডাল পড়ে গেছে, দেখছ; এর নিচে বসতাম।'' মাস্টারমশাই বলছেন, ''আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙে নিয়ে গেছি—বাড়িতে রেখে দিয়েছি।'' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন, ''কেন?'' মাস্টারমশাই উত্তর দিচ্ছেন, ''দেখলে আহ্লাদ হয়, সব চুকে গেলে **এই স্থান মহাতীর্থ হবে।**'' এসব দৃশ্য ছবির মতো আমাদের চোখে ভাসে।

আর একটি দৃশ্য। ১৮৮৪ সালের ২৫ মে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণদেবের জন্ম ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়াতে। কিন্তু তখন তাঁর হাত ভেঙে গিয়েছিল বলে উৎসব হয়নি। তাই ভক্তেরা এই দিনটি ঠিক করেছিলেন। সেদিন পঞ্চবটীতে সকলে ঠাকুরকে নিয়ে বসেছেন। ঠাকুর বটবৃক্ষের

চাতালে বসেছেন। পাশে কেদার, বিজয় প্রমুখ। মাস্টারমশাই দেরিতে এসেছেন; ঘরে ঠাকুরকে না পেয়ে পঞ্চবটীতে এসে দেখেন সকলে এখানে। একদম ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়েও ঠাকুরকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, ''তিনি কোথায়?'' সবাই হেসে উঠলেন। তখন মাস্টারমশাই সামনে ঠাকুরকে দেখে অপ্রস্তুত। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। ঠাকুরের দুপাশে কেদার ও বিজয়। তাঁদের দেখিয়ে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, ''দেখ, কেমন দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছি!'' সবাই মিলে কত আনন্দ, কীর্তন, গান, কত কী! মাস্টারমশাই ঠাকুরের মুখের কথা এবং সেখানকার সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে রেখেছিলেন। তাই আজ আমরা কথামৃত পড়ে সব জানতে, বুঝতে পারছি।

তাছাড়া কথামৃতের ভাষা। এত সহজ সরল শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের ভাষা যে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তিনি উপমা চয়ন করেছেন চারপাশের জীবন থেকে। উপমাগুলি সকলেরই অতি পরিচিত। সরল ভঙ্গিতে সাবলীলভাবে তিনি গভীর ধর্মীয় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত সাধারণ মানুষও সেসব কথা শুনে বুঝতে পারে। কথাগুলি যেমন গভীর তেমনই মাধুর্যময়। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের উদারতা। ঈশ্বর অনন্ত, তাঁকে লাভ করবার পথও অনন্ত। কথামৃতে দেখছি, সব মতের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসছে এবং সকলকে তিনি তাদের মতো করে ভগবানলাভের উপদেশ দিচ্ছেন। তরুণদের কাছে তিনি একরকম কথা বলতেন, বিষয়ী সংসারীর কাছে আর একরকম করে, ভক্তের কাছে আর একরকম করে। জ্ঞান ভক্তি কর্ম সম্পর্কিত সবরকম কথাই কথামৃতে রয়েছে। সমস্ত মতবাদ যেমন দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির মূল কথা, সাকার নিরাকারের কথা, যোগ তন্ত্র শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি সব মতই আছে। তাই সবরকম মনোভাবাপন্ন মানুষই কথামৃতের পাতায় আজও মনের রসদ খুঁজে পায়। এই আবেদন চিরকালীন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মানুষ যেত নিজেদের জীবনসমস্যা নিয়ে। এই সমস্যাগুলি আমাদেরও সমস্যা। যেমন, সন্তানশোকগ্রস্ত পিতা এসেছেন তাঁর কাছে, ভক্ত জানতে চাইছেন ভগবানে কী করে মন হয়। ঠাকুর সেগুলির সমাধান হিসেবে যে-অমৃত দিয়ে গেছেন সেগুলি এখনও পর্যন্ত মানুষকে শান্তি দিচ্ছে।

কথামৃতে মাস্টারমশাই নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখেছেন। তিনি দর্শক। নিজের কথা এতটুকু না বলে, নিজের পরিচয় গোপন রেখে তিনি নানাভাবে শুধু ঠাকুরকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাই ঠাকুরকে আমরা বাধাহীনভাবে দেখতে পাই। লেখকের চোখের দৃষ্টি আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে না। তিনি নিজের মনের কোনও রং শ্রীরামকৃষ্ণের উপর চাপাননি। এইটি মানবসভ্যতার একটি বড় প্রাপ্তি।

ধর্ম যুগোপযোগী না হলে সকলের পক্ষে তা পালনীয় হয় না। বেদে উপনিষদে যা আছে শ্রীরামকৃষ্ণ তা বলে গেছেন এযুগের উপযোগী করে। তিনি নিজেই বলেছেন, আজকাল দরকার ফিভার মিক্সচার; কবিরাজি পাঁচন তৈরি করতে হলে রোগীর অবস্থা বিপন্ন হয়ে যায়। এখনকার উপযুক্ত করে, প্রাঞ্জল করে ধর্মকে উপস্থাপন করেছেন তিনি। কথামৃত এত জনপ্রিয় হয়েছে এইজন্যই।

স্বামীজী বলে গেছেন, এই কথামৃত ভবিষ্যতে জগতে শান্তি বর্ষণ করবে। মানুষ শাস্ত্রপাঠের অধিকার পায় প্রথমে কিছু জ্ঞান অর্জন করে নিয়ে। কিন্তু কথামৃত পাঠ করবার জন্য সেরকম কিছুরই প্রয়োজন হয় না। শুধু আন্তরিকতা সম্বল করেই মানুষ অগ্রসর হতে পারে। দেশ জাতি ধর্ম মত পথ বয়স সবকিছু নির্বিশেষে কথামৃত শান্তি বর্ষণ করে চলেছে এবং যতদিন সভ্যতা থাকবে ততদিন মানবমনের কাছে তার আবেদন অক্ষুণ্ণ থাকবে।